ঢোকরা

মীরা মুখোপাধ্যায়

আজকের দিনে যদিও ঢোকরা নামটা বেশি প্রচলিত, প্রকৃতপক্ষে নানান নামের লোকজন এই ধরনের পিতলের কাজ করে থাকে। যেমন মালাহার, মাড়াল, ঢোকরা, ঘড়ুয়া, ঘণ্ট্রার, সিতড়িয়া ইত্যাদি। যিনি প্রথম এই লোকশিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তাঁর যোগাযোগ ছিল ঢোকরাদের সঙ্গে এবং যে গ্রাম থেকে তিনি নিদর্শন সংগ্রহ করেন, সে গ্রামের লোকেরা শিল্পীদের ঢোকরা কামার বলত। সেই থেকে এই ধরনের পিতলশিল্পের সাধারণ নামকরণ হয়ে যায় ঢোকরাদের নামে। পুঁথিপত্র অনুসন্ধান করে ঢোকরাদের ইতিহাস জানার উপায় নেই। তবে কোনো পুরনো সেন্সাসে 'ঢোকড়' বলে একদল লোকের নাম পাওয়া যায়। তারা নাকি গুজরাত অঞ্চল থেকে এসেছিল এবং এরাও গহনার কাজকর্ম করত।

বিভিন্ন পিতলশিল্পী সম্প্রদায়ের কাজ করার পদ্ধতি মোটামুটি সদৃশ হলেও কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেইসব পার্থক্যের কারণ সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের সুবিধা-অসুবিধাগুলো, বিশেষত মালমশলা সংগ্রহের দিক থেকে। আর্থিক অনটনের কারণেও তারতম্য ঘটে। এমনও হয়েছে অন্যান্য শিল্প থেকে লোকজন এসে পিতলের কাজ করতে শুরু করেছে, এবং কার্যপদ্ধতির হেরফের ঘটিয়েছে। প্রথম কারণটিই অবশ্য প্রধান। যেমন, বস্তার অঞ্চলের শিল্পীরা মোম ব্যবহার করে এবং ওদের উনুনের সঙ্গে হাপরের ব্যবস্থা থাকে। অথচ বাংলাদেশে একই ধরনের কাজ হয় ধুনো ব্যবহার করে এবং হাপরের হাওয়ার বদলে প্রাকৃতিক হাওয়ার উপর নির্ভর করে। বিহারে কোথাও কোথাও মোম বা ধুনোর বদলে পিচ দিয়ে কাজ হতো। মোমের কাজ ঢালাই-এর পর মোটা হয়, ধুনোর কাজ হয় পাতলা, পিচেরও তাই। বাংলাদেশে ধুনো ব্যবহারের কারণ সম্ভবত এই যে, এখানকার শিল্পীরা খুবই গরীব, মোমের চেয়ে ধুনো সস্তা, আবার পিতলও কম লাগে।

বাসস্থান নির্বাচনের ব্যাপারে লক্ষ করা যায় যে এরা বনের কাছাকাছি কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলোতে থাকা পছন্দ করে। এর পেছনেও অর্থনীতি কাজ করছে। প্রথমত বনের ধারে কোনো জালানির খরচা নেই। পেতলের কাজের জন্য মাটির দরকার হয়, তদুপযোগী মাটিও এসব অঞ্চলে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, সচ্ছল কৃষকদের কাছাকাছি থাকলে বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা। কৃষকরা সঞ্চয়ের জন্য মূল্যবান ধাতু কিনে রাখতে চায়, দরকার হলে যেগুলো বেচে ফের ক্যাশ টাকা পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ঢোকরাদের

boipattor.in

boipattor.in

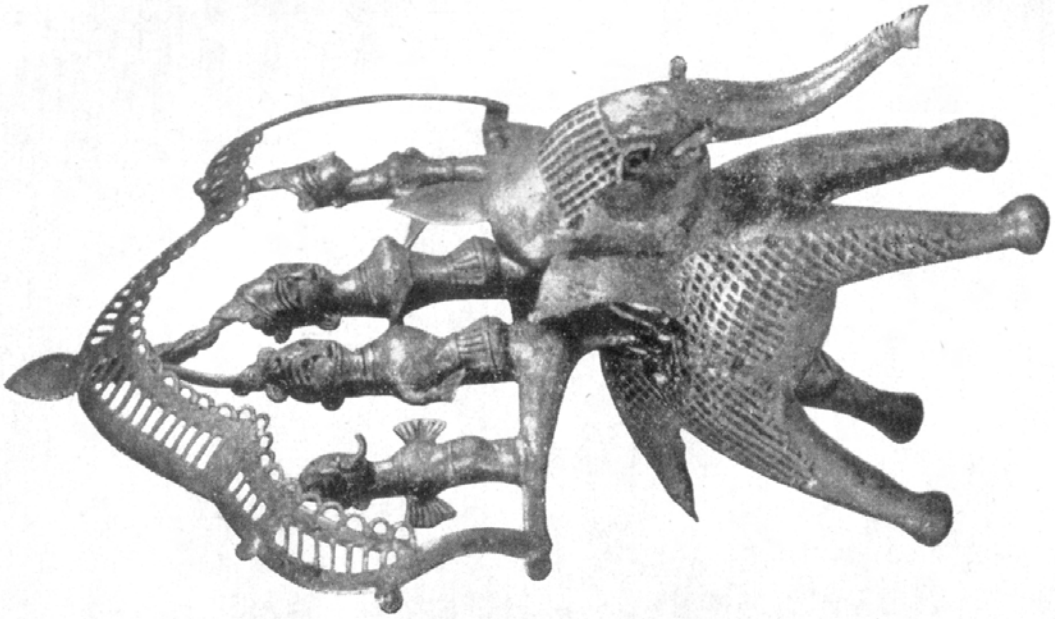

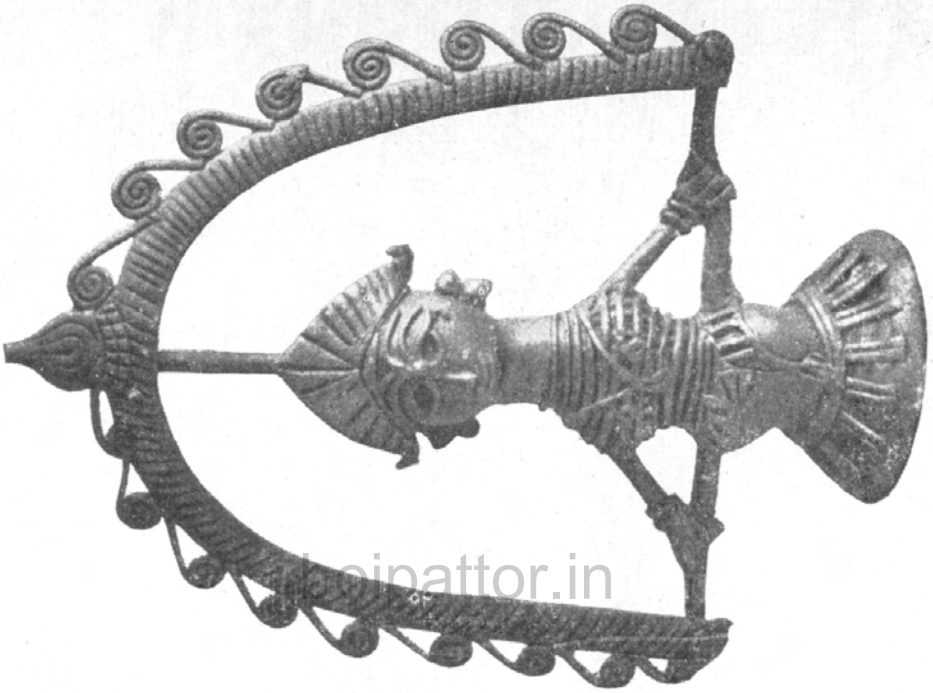

boipattor.in

মূর্তিগুলো পালাপার্বণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ঢোকরা কাজের চাহিদা বেশি। মূর্তিগড়ার সময় স্বভাবতই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ক্রেতাদের চাহিদার কথা মনে রাখতে হয়। বাংলাদেশে লক্ষ্মীর সাজের চাহিদা বেশি। বস্তার অঞ্চলে অন্যধরনের মূর্তির চল বেশি, ভৈরব মূর্তি, ঘোড়ার উপর যম ইত্যাদি।

প্রায় সর্বত্রই পিতলশিল্পীরা তাদের ধাতু বা কাঁচামাল সংগ্রহ করে পিতলের পুরনো বাসনকোসন থেকে। বস্তারে দেখা যায় পিতলশিল্পীরা খুব ভালভাবে জানে কোন বাসনের সঙ্গে কোন বাসন কতটা মেশালে ভাল ধাতু তৈরি হবে। অর্থাৎ ধাতুমিশ্রণের ব্যাপারে এদের ভাল অভিজ্ঞতা আছে। যেমন প্রায়ই দেখা যায়, এরা পুরনো পিতলের বাসনের সঙ্গে বারাণসীর ঘড়া মেশায়। বারাণসীর ঘড়ায় কিছু পরিমাণে টিন থাকে, ফলে এই মিশ্রণে মূর্তিটা বেশ মজবুত হয়। উড়িষ্যার কারিগরদেরও ধাতুর প্রতি দৃষ্টি আছে। বাংলা দেশে বাঁকুড়ায় ছিল নকুল—সে জানত ধাতু শক্ত করার কলাকৌশল। তবে দেরিপুরের কারিগররা এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। এমনও অনুমান করা যায় যে বস্তারে একসময় এই সব কাজই পিতলের বদলে সোনা দিয়ে করা হতো। বস্তারে একটি মূর্তিকে ভাঙ্গারাম বলে। এই মূর্তিটি যম অথবা ভৈরবের মতোই ঘোড়ায় চড়া দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের সিংহাচলম্-এর মন্দিরে গিয়েও আবার ঐ ভাঙ্গারাম কথাটা শোনা যায়। কিন্তু সেটি একটি সোনার সিংহাসন। সোনাকে ওরা ভাঙ্গারাম বলে। কোটাগিরিতে তৈরি কয়েকটি গহনার নিদর্শন মাদ্রাজ মিউজিয়ামে আছে। এইসব গহনা সোনার তৈরি এবং এই একই পদ্ধতিতে। এ ছাড়া এই জাতীয় কারিগররা বিহারে এখনো হাতের গহনা গড়ে, বস্তারে পায়ের গহনা গড়ে। গহনা সাধারণত সোনার হতো।

স্টাইল সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এদের স্টাইল সম্পূর্ণভাবে এদের টেকনিকের সঙ্গে বাঁধা। মূর্তির আকার প্রকার গঠন নির্মাণ ঠিক করার সময় কারিগরকে মূর্তি তৈরির সবকটি ধাপের কথা ভেবে রাখতে হয়। গঠন এমন হতে হবে যাতে সেখানকার মাটি দিয়ে সেটি নির্মাণ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। দ্বিতীয়ত ধুনো বা মোমের ছাঁচ তৈরির উপযোগী গঠন হওয়া চাই। তৃতীয়ত গঠন এমন হতে হবে যাতে ঢালাই-এর সময় বিশেষ অসুবিধায় না পড়তে হয়, সহজেই কাজটা সম্পাদন করা যায়। এতগুলো দিক মেলাতে গিয়ে গঠনের ওপর যে সব সর্ত এসে পড়ে সেগুলো থেকেই একটা স্টাইল বেরিয়ে আসে। এ ছাড়া হেরিটেজ, পরম্পরা তো আছেই। তবে টেকনিকের প্রভাবটাই আসল।

উত্তর সীমান্ত থেকে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত যে পদ্ধতিটি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে সেটা হল লস্ট ওয়াক্স্ টেকনিক। মাটির গঠনের ওপর মোমের কাজটা করে তার ওপর আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়। তারপর গরম করে মোমটাকে পুড়িয়ে বা গলিয়ে বের করে দেওয়া হয়। যে শূন্যস্থানটি

boipatto.in

তৈরি হল, তাকে গলা পিতল দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়। বাসনের ক্ষেত্রে মোম না দিয়ে মাটির গঠনের উপর অস্ত্র দিয়ে চেঁচে এই শূন্যস্থান তৈরি করা হয়। কোথাও আবার বাসনের ক্ষেত্রেও মোমের ব্যবহার আছে।

ঢোকরাদের ও অন্যান্য পিতলশিল্পীদের জীবনযাত্রায় কর্মময়তা লক্ষ করা যায়। প্রায় সবরকম সংস্কার ও বিশ্বাস এদের মধ্যে প্রশ্রয় পায়। আর্থিক অভাব-অনটন এদের মধ্যে খুবই প্রকট, কিন্তু তার জন্য এরা বিধাতাকে দোষ দেয় না। এরা নিজেদের খুবই নীচু অধম বলে মনে করে, অবশ্যই এর পেছনে সামাজিক পরিবেশ দায়ী। হীনমন্যতার কারণে হয়তো এদের সহ্যশক্তিও বেড়ে গেছে। তবে নিজেদের মধ্যে আনন্দ-ফুর্তির নানা ব্যবস্থা এরা করে নিয়েছে। গান করে, যাত্রা করে। এদের জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই গান জড়িয়ে আছে। বাংলার পিতলশিল্পীরা যাত্রা খুব ভালবাসে। রামায়ণ, মহাভারত কৃষ্ণলীলা ইত্যাদিই থাকে বিষয়। মদ্যপানের খুবই চল আছে এদের মধ্যে। বস্তারের কারিগররা মুর্গী খেলায়। পাশাপাশি উড়িষ্যা থেকে ব্রাহ্মণরা এসে এদের রামায়ণপাঠ শেখায়। পিতলশিল্পীদের সম্পর্কে চৌর্যবৃত্তির যে অপবাদ আছে তা এরা অস্বীকার করে।

কোনো কোনো জায়গায় পিতলশিল্পীদের মধ্যে চাষবাসও দেখা যায়। সেখানে হয়তো এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিছু কিছু ক্রেতা থাকে যারা ভাল দামে এদের জিনিষ ক্রয় করে। যেমন, বস্তারে মুরিয়া বা মারিয়া জাতির লোকজন। তবে এদের সঙ্গে কেনাবেচা হয় টাকার মাধ্যমে নয়, দ্রব্যবিনিময় প্রথায়। এখন সরকার হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌ বোর্ডের মাধ্যমে এদের কাজ বাইরে পাঠাচ্ছেন। এর ফলে অবশ্য অর্ডার-মাফিক কাজ এদের করতে হচ্ছে এবং তার ফলে কাজের মান নীচু হয়ে যাচ্ছে। যেসব শিল্পীর মধ্যে সজীবতা আছে তাঁরা অবশ্য আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে লাভবানই হয়ে থাকেন, ক্ষতিগ্রস্ত হন না। বরাবরই তো এরকম হয়েছে, আদান-প্রদানের মাধ্যমেই এ শিল্প টিকে আছে। এই কাজের শিল্পী তাই মহেঞ্জোদড়োর ঘোড়াও করেছে, জৈন মূর্তি কপি করেছে, দেশের যাত্রা থিয়েটার, ক্যালেণ্ডার সব কিছু থেকেই সে গ্রহণ করে যাচ্ছে। তাই আমরা কখনো দেখি ভগবতী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে, কখনো বা কোনো দেবতা তামাক টানছেন।

boipattor.in